জমা’ নামায ও
কতিপয় মসলা প্রসঙ্গে

দু’টো কথা

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা’ত আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রেরিত প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ ও ইমাম মাহ্‌দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত। এ জামাতের সদস্য সদস্যা হিসেবে আমরা প্রকৃত ইসলামের নিষ্ঠাবান অনুসারী। তাই আমরা কুরআন, সুন্নত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নিয়ম কানুনাদি পালন করে থাকি। যারা ইসলামের নামে অন্যদের খোশ খেয়ালে প্রতিষ্ঠিত নিয়ম কানুন পালনে অভ্যস্ত তারা অযথা এই জামাতের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ ছড়ায় ও অপপ্রচার করে থাকে। **জমা’ নামায ও কতিপয় মসলা প্রসঙ্গে** পুস্তিকায় জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান কুরআন, সুন্নত, হাদীস ও যুক্তির ভিত্তিতে ওসব মিথ্যার অসারতা তুলে ধরেছেন। আল্লাহ্‌ তার এ শুভ প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করুন এই আকুতি জানাচ্ছি। এই পুস্তিকার পান্ডুলিপি দেখে দিয়েছেন মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক, সদর মুরব্বী। তা ছাড়া যারা এই পুস্তিকা প্রকাশনায় যে যেভাবে জড়িত আছেন তাদেরকে আল্লাহ্‌তা’লা যথোপযুক্ত পুরস্কারে ভূষিত করুন তাঁর দরবারে দরদে দিলে এ দোয়া করছি। হে আল্লাহ! তুমি তা কবুল করো। আমীন

খাকসার
মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা’ত বাংলাদেশ

তারিখ ঃ
১৪ শ্রাবণ, ১৪০০ সাল
২৯ জুলাই, ১৯৯৩

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

জমা' নামায ও কতিপয় মসলা প্রসঙ্গে

নবী-রসূলের অন্তর্ধানের পর যতই দিন যেতে থাকে ততই তাঁর অনুসারীদের মধ্যে ধর্মের অনুশাসনাদি নিয়ে বিভ্রান্তি এবং বাড়াবাড়ি পরিলক্ষিত হয়। আমাদের পূর্বে বনী ইসরাঈলের কথাই ধরা যাক না কেন। হযরত মুসা (আঃ)-এর পর তারা ধর্মীয় বিধানকে 'পিঠের পিছনে' ফেলে খুঁটি-নাটি বিষয় নিয়ে নিজেদের কতকগুলো মনগড়া বিধান রচনা করে, এমনকি হালাল জিনিষকে হারাম করে নেয়। উম্মতে মুহাম্মদীয়াও এখেকে পিছনে নেই। তারা হালাল জিনিষকে হারাম করেনি বটে কিন্তু ধর্মীয় বিধানের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে সহজ ও সরলতায় অহেতুক কাঠিন্য ও বাড়াবাড়ি সৃষ্টি করেছে এবং নতুন নতুন বিষয় সংযোজন করেছে তথা বিদ্‌আত সৃষ্টি করেছে। অথচ আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) বলেছেন— কুল্লো বিদ্‌আতেন যালালাতুন আয্ যালালাতুন ফিন্নার অর্থাৎ সর্ব প্রকার বিদ্‌আত (নব-সৃষ্টি) পথ ভ্রষ্টতা আর পথ ভ্রষ্টতা আগুনে (নিয়ে যায়)।

বিদ্‌আত বা নতুন সৃষ্টির মধ্যে আমরা নামাযের নিয়্যত সম্বলিত বাক্যাদি, নামায শেষে হাত উঠিয়ে মোনাজাত এবং যা বাদ দেয়া হয়েছে তন্মধ্যে মসজিদে মেয়েদের বা-জামাতে নামায পড়া থেকে বঞ্চিত রাখা, সফরে রোযা না রাখা এবং প্রয়োজনে দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে জমা' করে পড়ার কথা উল্লেখ করতে পারি।

আখেরী যুগে যে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ আসবেন তাঁর কাজ হবে "ইউহ্‌য়িদ্দীনা ওয়া ইউকীমুশ্ শারীয়াহ্" অর্থাৎ তিনি ধর্ম তথা ইসলামকে যিন্দা করবেন এবং শরীয়তকে প্রতিষ্ঠা করবেন। আজ মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রতি দৃষ্টিপাত করলে মসলা মাসায়েল নিয়ে যে মতভেদ দেখা যায় তাতে আসল বিষয় সম্বন্ধেই অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন। কিন্তু এসব সমাধানের লক্ষ্যে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে একজন হাকাম ও আ'দেল অর্থাৎ ন্যায়-বিচারক ও মীমাংসাকারীর আবির্ভাবের কথা আছে। যথাসময়ে ইসলামে সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হিসেবে ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ রূপে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) আবির্ভূত হয়েছেন। তিনিই এ যমানায় ন্যায়-বিচারক ও মীমাংসাকারী। তিনি এসে ইসলামের অভ্যন্তরে যেসব মতভেদ ও বিদ্‌আত সৃষ্টি হয়েছিল তার সঠিক সমাধান দিয়েছেন-যা বাদ দেয়ার তা বাদ

দিয়েছেন আর যা অযথা বাদ দেয়া হয়েছিল তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর অনুসারী আহমদীয়া মুসলিম জামাত মসলা মাসায়েলের ব্যাপারে যখন তাঁকে অনুসরণ করে তখন নবাগত আহমদী বা যারা এখনও এ জামাতে আসেননি তাদের নিকট এসব কিছু নতুন বলে মনে হয় এবং তারা বিপাকে পড়েন। প্রকৃতপক্ষে এগুলো নতুন নয়। তাদেরকে বিপাকমুক্ত করার লক্ষ্যে এ বিষয়গুলো সম্বন্ধে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা যাচ্ছেঃ-

নামাযের নিয়্যত ঃ

নামাযের জন্যে নিয়্যত করা জরুরী। নিয়্যত অর্থ মনের সংকল্প বা ইচ্ছা। এর সম্পর্ক অন্তরের সাথে। ইহা করার বিষয় পড়ার বিষয় নয়। কোন কাজ করার পূর্বে একজন লোকের মনে স্বভাবতই কাজটির স্বরূপ, প্রকৃতি, কিভাবে কখন করবে বা করতে হবে তা জাগরুক থাকে। সুতরাং তাকে মুখ দিয়ে তা বলার প্রয়োজন হয় না। আহ্মদী মুসলমানগণ নামাযের পূর্বে নামাযের ওয়াক্ত, কি নামায এবং কত রাকায়াত নামায ইত্যাদি প্রসংগে মনে মনে সংকল্প করে নেয়। প্রচলিত ধরা বাঁধা কতগুলো বাক্য তারা উচ্চারণ করা অত্যাবশ্যক মনে করেন না। কেননা হুযুর পাক (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম এগুলো পাঠ করেছেন বলে কোন সনদ নেই। অথচ বাজারে যেসব নামায শিক্ষা, কায়দা বা পঞ্জিকা দেখা যায় তার মধ্যে ধরা বাঁধা কতকগুলো নিয়্যত পাওয়া যায়। একজন শিক্ষানবীশকে এগুলো শিখতে কত যে পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করতে হয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ এ বিদ্আতের পিছনে সময় ব্যয় না করে তারা যদি নামাযের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও তত্ত্ব সম্বন্ধে শিখে তাহলে বোধ করি তাদের নামায পড়া সার্থকতার পথে একধাপ অগ্রসর হতে পারবে। নিয়্যতের ব্যাপারে হযরত ইমাম গায্যালী (রহঃ) তাঁর প্রণীত 'কিমিয়ায়ে সাদত' পুস্তকের ইবাদত খন্ডে যথার্থই বলেছেন—নিয়্যত করার বিষয় পড়ার বিষয় নয়।

একামাত ঃ

জামাতে নামায পড়ার পূর্বে একামাত দিতে হয়। এর অর্থ এই যে, নামায এখনই শুরু হতে যাচ্ছে। এ প্রসংগেও আহ্মদীগণ আঁ হযরত (সাঃ)-কেই অনুসরণ করে থাকেন। কিন্তু সুন্নাহ্ ওয়াল জামাত আযান ও একামাতকে এক প্রকার করে ফেলেছেন এবং এর কোন সনদ আছে বলে আমাদের জানা নেই। মানুষের বিবেক বুদ্ধিও একথায় সায় দেয় যে, আযান ও একামাতের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকা আবশ্যক। এ প্রসংগে আমরা মাত্র বুখারী শরীফের নিম্নোক্ত হাদীস খানা উদ্ধৃত করতে চাই ঃ

'আন আনাসেন কালা উমেরা বেলালুন আন্ ইয়াশফাআল আযানা ওয়া আন্ ইউতিরাল একামাতা কালা ইসমাঈলু ফাযাকারতুহু লে আইউবা ফাকালা ইল্লাল একামাতা অর্থাৎ আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ আযানের বাক্যগুলো জোড়ায় জোড়ায় এবং একামাতের বাক্যগুলো একবার করে বলার জন্যে বেলালকে হুকুম দেয়া হয়েছিল। ইসমাঈল বলছেনঃ আমি আইউবের কাছে একথা বলার পর তিনি বললেন, ঠিকই, তবে 'কাদ্‌কামাতিস্ সালাহ্' দু'বার বলতে হবে।

(আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত সহীহ আল্ বুখারীর বঙ্গানুবাদ ঃ ২৭৮ পৃষ্ঠা)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত আঁ হযরত (সাঃ)-এর উপরোক্ত হাদীসের অনুসরণ করে। আহলে হাদীস ও অন্যান্য কোন কোন ফেরকাও এ পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন। হজ্জের সময় টিভিতে যে নামায প্রচারিত হয় তাতেও এরূপ ভাবেই একামাত বলা হয়।

হাত বাঁধা ঃ

নামাযে দাঁড়িয়ে নিয়্যত করার পর 'তকবীরে তাহ্‌রীমা' অর্থাৎ 'আল্লাহু আকবর' বলে হাত বাঁধতে হয়। এ হাত বাঁধা নিয়ে উম্মতের মধ্যে বহু মতভেদ রয়েছে। কেউ বুকের ওপর হাত বাঁধেন, কেউ নাভীর নীচে, এমন কি কেউ হাত ছেড়ে দিয়ে নামায পড়েন, যেমন শিয়া ও মালেকী সম্প্রদায়। হাতবাঁধা সম্পর্কে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) বলেন, 'যদিও হাত ছেড়ে দিয়ে নামায পড়া কোন হাদীস কর্তৃক প্রমাণিত হয় না আর হাত বেঁধে দন্ডায়মান হওয়া প্রাকৃতিক নিয়মের দিক থেকে ইবাদতের জন্যে উপযোগী মনে হয়; তথাপি হাত ছেড়ে দিয়েও যদি নামায পড়া হয় তাহলে নামায হয়ে যাবে। মালেকীগণও শিয়াদের মত হাত ছেড়ে দিয়ে নামায পড়ে। মসনূন (অর্থাৎ আঁ হযরত (সাঃ)-এর সুন্নত বা অনুসরণে কৃতকর্ম— প্রবন্ধকার) পদ্ধতি উহাই যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে (অর্থাৎ হাত বেঁধে নামায পড়া)।

(ফাতাওয়া মসীহ মাওউদঃ পৃষ্ঠা-৪৬ ফেকাহ্ আহমদীয়ার ৭৬ পৃষ্ঠার সূত্রে)

আহ্‌মদীগণ নিম্নোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে হাত বাঁধে ঃ

আন সাহলি ইব্‌নে সা'দেন (রাঃ) কালা কানান্নাসু ইউ'মারুনা আন্ ইযায়ার্ রাজুলুল ইয়াদাল ইউমনা আলা যেরাইহিল ইউস্‌রা ফিস্ সালাতে অর্থাৎ হযরত সাহল ইব্‌নে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, [রাসূলুল্লাহ্

(সাঃ)-এর যুগে] লোকদেরকে নামাযে ডান হাত বাম 'যেরার' ওপরে স্থাপন করার জন্যে আদেশ দেয়া হত। *(বুখারী ঃ কিতাবুস্ সালাত)*

আরবী অভিধানে হাতের মধ্যমা আঙ্গুলের মাথা থেকে কনুই পর্যন্ত স্থানকে 'যেরা' বলা হয়। (মেফতাহুল লুগাত, মুনজেদ ও মুফরাদাত দ্রষ্টব্য) হাত বাঁধার সঠিক নিয়ম এই যে, নামাযে ডান হাতকে বাম হাতের ওপরে এমনভাবে রাখতে হবে যেন কব্জির ওপরে কব্জি থাকে আর বৃদ্ধাঙ্গুলী ও কনিষ্ঠাঙ্গুলী দিয়ে বাম হাত ধরতে হবে এবং বাকী ৩টি আঙ্গুল বাম হাতের পিঠের ওপরে সোজাভাবে বিস্তৃত করে রাখতে হবে (ফেকাহ্ আহ্মদীয়া ঃ ৭৭ পৃষ্ঠা)। যুক্তির খাতিরেও বিনীত ভাব প্রকাশের জন্যে হাত এভাবে বেঁধে রাখতে হয় কেননা একজন নামাযী 'তকবীরে তাহ্রীমা' বলে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার অন্তরকে আল্লাহ্মুখী করে হাত বাঁধে।

জমা' নামায ঃ

আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পদাংক অনুসরণে প্রয়োজনে যোহরের নামাযের সাথে আসর এবং মাগরিবের নামাযের সাথে এশার নামায আগে বা পরে একত্রে জমা' করে পড়ে থাকে। এতে অন্যেরা মনে করেন যে, ইহা বিদ্আত বা নতুন সৃষ্টি। প্রকৃতপক্ষে ইহা বিদ্আত নয় বরং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সুন্নত থেকে এর সনদ পাওয়া যায়। নিম্নে কুরআন এবং হাদীস থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা তা প্রমাণ করার চেষ্টা করবো ঃ

আল্লাহ্তা'লার পবিত্র কালাম কুরআন মজীদে নামাযের সময় সম্পর্কে যে সকল আয়াত পাওয়া যায় তার কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ

১। "আকিমিস সালাতা লেদুলুকিশ্ শামসে ইলা গাসাকেল্লায়লে ওয়া কুরআনাল ফাজরে ইন্না কুরআনাল ফাজরে কানা মাশহুদা।"

অর্থাৎ-তুমি সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে রাতের ঘোর অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম কর এবং প্রভাতে কুরআন পাঠ কর, প্রভাতে কুরআন পাঠ (আল্লাহ্র কাছে) নিশ্চয় গ্রহণীয়। *(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭৯ আয়াত)*

২। "ওয়াস্তাগফির লেযামবিকা ওয়াসাব্বিহ্ বেহামদে রাব্বেকা বেলআশিয়্যে ওয়াল ইবকার"।

অর্থাৎ-এবং তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর-তোমার (প্রতি যারা) ত্রুটি-বিচ্যূতির (অপবাদ দিয়েছে তাদের) জন্যে এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তোমার প্রতি-পালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। *(সূরা আল্ মোমেন ঃ ৫৬ আয়াত)*

৩। "মিন কাবলে সালাতিল ফজরে ওয়া হীনা তাযাউনা সিয়াবাকুম মিনায্‌যাহিরাতে ওয়ামিম বা'দে সালাতিল ইশায়ে"।

অর্থাৎ ফযরের নামাযের পূর্বে, দ্বিপ্রহরের সময় যখন তোমরা তোমাদের পোষাক খুলে রাখ এবং ইশার নামাযের পর। *(সূরা নূরঃ ৫৯ আয়াত)*

৪। "ওয়া আকিমিস সালাতা তারাফাইন্নাহারে ওয়া যুলাফাম্‌মিনাল লায়লে" অর্থাৎ - এবং তুমি দিবসের দুই প্রান্তে এবং রাত্রের বিভিন্ন অংশে নামায কায়েম কর। *(সূরা হুদ ঃ ১১৫ আয়াত)*

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে আমরা নির্দিষ্টভাবে নামাযের নাম এবং ওয়াক্ত সম্বন্ধে সঠিক দিক নির্দেশ পাই না। কিন্তু অন্য দিকে আল্লাহ্‌তা'লা মোমেনদেরকে নির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায় করার প্রতি তাকিদ দিয়েছেন। যেমন বলেছেন - "ইন্নাস্ সালাতা কানাত আলাল মু'মেনিনা কিতাবাম মাওকুতা" অর্থাৎ -নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে নামায কায়েম করা মু'মেনদের উপর ফরয। *(সূরা নেসা ঃ ১০৪ আয়াত)*

সুতরাং নামাযের সঠিক নাম এবং নির্ধারিত ওয়াক্তের জন্যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সুন্নতের প্রতি অবশ্যই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে, নচেৎ এ প্রসঙ্গে আমরা কেবল অন্ধকারেই হাত্‌ড়িয়ে মরব। নবী করীম (সাঃ)-এর সুন্নতের প্রতি পুরোপুরি পাবন্দ হওয়ার জন্যেও আল্লাহ্‌তা'লা কুরআন মজীদে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেমন তিনি বলেছেন-(ক) "ওয়ামা আতা'কুমুর্ রাসূলু ফাখুযুহু ওয়ামা নাহাকুম আনহু ফানতাহূ" অর্থাৎ- এবং এই রসূল তোমাদেরকে যা দান করেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে তোমরা বিরত থাক। *(সূরা আল্ হাশর ঃ ৮ আয়াত)*

পুনরায় আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন-(খ) "কুল ইনকুনতুম তুহেব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবেউনী" অর্থাৎ-বল, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস তাহলে তোমরা আমাকে অনুসরণ কর"। *(সূরা আলে ইমরান ঃ ৩২ আয়াত)*

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথাই আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, নামায, রোযা, ইত্যাদি অবশ্য পালনীয় বিষয়াদি এমন কি পানাহার জাতীয় ব্যবহারিক জীবনের খুঁটিনাটি যাবতীয় বিষয়াদির জন্যেও আমাদেরকে নবী-জীবনের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিপাত করতে হবে এবং তাঁকে অনুসরণ করতে হবে, নচেৎ ইবাদত ও মুসলিম-জীবনের পরিপূর্ণ ও অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌছতে সক্ষম হবো না।

জমা' নামায আদায় করাও উপরোক্ত বিষয়াবলীর অন্যতম। আহ্‌মদী মুসলমানগণ প্রয়োজনে জমা' নামায আদায় করে থাকেন। পূর্বেই বলেছি আহ্‌মদীগণ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পূর্ণ পায়রবী বা অনুসরণ করে। পূর্বেও বলেছি যে, আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) এসেছেন "ইউহয়িদ্দীনা ওয়া ইউকীমুশ্ শরীয়াহ্"-ধর্মকে পুনর্জীবিত করতে এবং শরীয়তকে প্রতিষ্ঠা করতে। আসুন আমরা এখন হাদীস পর্যালোচনা করে দেখার চেষ্টা করি যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সুন্নত জমা' নামাযের ব্যাপারে আমাদেরকে কি শিক্ষা দেয় ঃ

১। "ওয়া আন ইব্‌নে আব্বাসেন কালা কানা রাসূলুল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা ইয়াজমাউ বায়নাস্ সালাতেয্ যোহরে ওয়াল আসরে ইযা কানা আলা যাহরে সায়রেওঁয়া ইয়াজমাউ বায়নালমাগরিবে ওয়াল ইশায়ে" অর্থাৎ-হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যোহর ও আসরের নামায একত্রে পড়তেন যখন তিনি সফরে থাকতেন এরূপে তিনি মাগরিব ও ইশাকেও একত্রে পড়তেন।

(বুখারীঃ বাবুস্ সালাত, আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত)

২। "আন আবি আব্বাসেন (রাঃ) আন্না নাবীয়া সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা বিল মাদীনাতে সাবআন ওয়া সামানিয়ান আয্‌যোহরা ওয়াল আসরা ওয়াল মাগরিবে ওয়াল ইশায়ে" অর্থাৎ-হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী (সাঃ) মদীনায় আট রাকায়াত যোহর ও আসরের এবং সাত রাকায়াত মাগরিব ও ইশার (একত্রে) পড়েছিলেন।

(তজরীদুল বুখারীঃ কিতাবুস্ সালাত, বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত)

৩। "আন ইব্‌নে উমারা (রাঃ) কালা জামা'আন্নাবিউ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা বায়নাল মাগরিবে ওয়াল ইশায়ে বেজামইল কুল্লো ওয়াহেদাতেম মিনহুমা বেএকামাতেওঁয়া লাম ইউসাব্বেহ্ বায়নাহুমা ওয়া আলা ইসরী কুল্লে ওয়াহেদাতেম্ মিনহুম" অর্থাৎ- হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী (সাঃ) মুজদালেফাতে মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে জমা' করে পড়িয়েছিলেন, এর মধ্যে প্রত্যেক নামায আলাদা তকবীরের সাথে পড়েছিলেন ; কিন্তু এর আগে পিছনে বা মাঝখানে কোন নফল বা সুন্নত নামায পড়েন নি। *(বুখারীঃ বাবুল জামই বায়না সালাতায়নে ফিল মুজদালেফাতে)*

৪। "আন ইবনে আব্বাসেন আন্নান্নাবীয়্যা (সাঃ) সাল্লা বেল মাদীনাতে সাবআন ওয়া সামানিয়ান আয্‌যোহরা ওয়াল আসরা ওয়াল মাগরিবা ওয়াল

ইশায়া ফাকালা আইউব, লায়াল্লাহু ফি লায়লাতেন মাতেরাতেন কালা আসা" অর্থাৎ-ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত (তিনি বলেন), মদীনাতে নবী (সাঃ) যোহর ও আসরের আট রাকায়াত এবং মাগরিব ইশার সাত রাকায়াত (নামায) এক সাথে আদায় করেছেন (বর্ণনাকারী) আইউব (পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী জাবের ইবনে যায়েদকে) বললেন, বোধ হয় বাদলা দিনে নবী (সাঃ) এমনটি করেছেন। (জাবের ইবনে যায়েদ জবাবে বললেন) তাই হবে হয়ত। *(আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত সহীহ আল বুখারী, ২৫৩ পৃষ্ঠা থেকে)।*

৫। "আন্ ইবনে আব্বাসেন কালা সাল্লা রসূলুল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা যোহরা ওয়াল আসরা জামিয়ান ওয়াল মাগরিবা ওয়া ইশায়া জামিয়ান ফি গায়রে খাওফেন ওয়া সাফ্রেন" অর্থাৎ-হযরত ইব্নে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল করীম (সাঃ) যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশা জমা' করে পড়েছেন বিনা ভয়ে এবং বিনা সফরে।

(সহী মুসলিমঃ বাবু জওয়াজেল জাম্‌য়ে বায়নাস্‌সালাতায়নে ফিস সাফ্‌রে)

৬। "আন ইবনে আব্বাসেন কালা জামাআ রাসূলুল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা বায়নায্ যোহরে ওয়াল আসরে ওয়াল মাগরিবে ওয়াল ইশায়ে বিল মদীনাতে ফি গায়রে খাওফেন ওলা মাতারেন ......" অর্থাৎ-হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল করীম (সাঃ) যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশার নামায ভয় বৃষ্টি ছাড়াও একত্র করে পড়েছেন—ঐ)।

৭। "আবদুল্লাহ ইবনে শকীক (রাঃ) বলেন-হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) একদিন আমাদের মধ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন। আসরের নামাযের বাদে যখন সূর্য অস্তমিত হল এবং তারকারাজি দেখা গেল, তখন লোকেরা বলতে লাগলো নামায, নামায। পুনরায় বনী তামিম গোত্রের এক ব্যক্তি আসল, সেও বার বার বলতে লাগলো, নামায, নামায। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তোমার মাতা ধ্বংস হউক, আমাকে সুন্নত শিখাতে এসেছে। পুনরায় বল্লেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশা জমা' করে পড়তে দেখেছি। আব্দুল্লাহ ইবনে শকীক বলেন, আমার একটু সন্দেহ লাগল তাই আমি আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথা সত্য—ঐ)।

৮। "আন ইবনে আব্বাসেন কালা জামায়া রাসূলূল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা বায়নায্ যোহরে ওয়াল আসরে ওয়া বায়নাল মাগরিবে

ওয়াল ইশায়ে বেল মদীনাতে মিন গায়রে খাওফেন ওলা মাতারেন, কালা ফাকীলা লে আব্বাসেন মা আরাদা বেযালিকা, কালা আরাদা আন্ লাইয়াহ্‌রুজা উম্মাতুহু" অর্থাৎ-হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনাতে একত্র করে পড়েছেন যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশার নামায ভয় এবং বৃষ্টি ব্যতিরেকেও। হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল যে, তিনি (সাঃ) কেন এ রকম করেছেন। তিনি বলেন, উম্মতের যেন কষ্ট না হয় এজন্যে।

(তিরমিযীঃ বাবু মাজায়া ফিল জাম্‌য়ে বায়নাস্ সালাতায়নে)

৯। "হাকাম বলেন-আমাকে আবুবকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহ্‌মদ ইবনে বালুবিয়া, তাকে মূসা ইব্‌নে হারুন, তাকে কুতায়বা ইবনে সাঈদ, তাকে লায়েস ইবনে সাঈদ ইয়াযীদ ইবনে হাবীব থেকে, তিনি আবু তুফায়েল থেকে ও তিনি হযরত মায়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন-নবী করীম (সাঃ) তাবুকের যুদ্ধে যখন লিপ্ত ছিলেন তখন তিনি সূর্য হেলার আগে সফরে বের হলে যোহর বিলম্বিত করে আসরের সাথে পড়ে নিতেন। তবে যদি সূর্য হেলার পর সফর শুরু করতেন তাহলে যোহর ও আসর একসংগে পড়ে নিয়ে সফর শুরু করতেন। তেমনি যদি মাগরিবের আগে সফর শুরু করতেন, তাহলে মাগরিবকে বিলম্বিত করে ইশার ওয়াক্তে একত্রে পড়ে নিতেন, আর যদি মাগরিবের পর শুরু করতেন তাহলে ইশা ও মাগরিবের সাথে পড়ে নিতেন।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (রাঃ) বলেন -"সুতরাং যে কোন অসুবিধাকর অবস্থায় প্রয়োজনে দু'ওয়াক্তের সমাহার উত্তম"।

(হাফেয ইবনে কাইয়িম জাওজিয়া প্রণীত 'যাদুল মায়াদ' পুস্তক থেকে উদ্ধৃত-২৯৭ পৃঃ, পুস্তকটি প্রকাশ করেছে-ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

১০। "আরয (রাঃ) থেকে বর্ণিত-রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর তাবুক সফর কালে যোহর ও আসর নামায একত্রে পড়েছিলেন।"

(রেওয়ায়াত-৪০১, মোয়াত্তা ইমাম মালেক, বঙ্গানুবাদ (প্রথম খন্ড), ১৯১ পৃষ্ঠা, ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত)

"নাফি (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে-আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি কোন কারণ বশতঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দ্রুত ভ্রমণ করিতে হইত, তবে মাগরিব ও এশা একত্রে পড়িতেন।"

(ঐ, রেওয়ায়াত-৪০৩, ১৯২ পৃষ্ঠা)

'আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত-ভয়-ভীতি জনিত কোন কারণ ছাড়া এবং সফর ব্যতিরেকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে যোহর ও আসর একসঙ্গে এবং মাগরিব ও এশা একত্রে পড়াইয়াছে।"

(ঐ, রেওয়ায়াত-৪০৪, ১৯২ পৃষ্ঠা)

উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে আমরা জানতে পারি যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বিভিন্ন সময়ে নামায জমা' করে পড়েছেন, যেমন ঃ

(ক) আরাফাতের ময়দানে যোহরের সাথে আসর পড়েছেন। হাজীরা হজ্জের সময় এখনও এভাবে পড়াকে সুন্নত মনে করেন,

(খ) মুজদালেফাতে ইশার সাথে মাগরিবের নামায পড়েছেন। হাজীরা হজ্জের সময় এখনও এভাবে পড়াকে সুন্নত মনে করেন,

(গ) সফর, ভয় ও বৃষ্টির সময়ে যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশার নামায জমা' করে আগে বা পরে পড়েছেন। এ ছাড়াও ধর্মীয় কোন অনুষ্ঠানাদির সময়ে নামায জমা' করেছেন।

(ঘ) এমন কি তিনি খন্দকের যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার কারণে পাঁচ ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করেছেন।

আখেরী যামানায় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসারীগণ অবক্ষয়ের কালস্রোতে ধ্বংসের কিনারায় গিয়ে পৌঁছলে তাদের উদ্ধার কল্পে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে এক ব্যক্তির আবির্ভাব হওয়ার কথা আছে। তিনি প্রতিশ্রুত মাহ্দী ও মসীহ্ (আঃ)। তাঁর আগমন বলতে গেলে আঁ হযরত (সাঃ)-এরই দ্বিতীয় আগমন। *(সূরা জুমুআ ঃ ৩ আয়াত ও বুখারী কিতাবুত্ তফসীর)*

যেহেতু আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সময়ে "তকমীলে শরীয়াত" অর্থাৎ - শরীয়তের পূর্ণতা হয়েছে। *(সূরা মায়েদাঃ ৪ আয়াত)*

তাঁর দ্বিতীয় আগমনের মাধ্যমে "তকমীলে ইশায়াত" অর্থাৎ-সত্যের পূর্ণ প্রচার সাধিত হওয়ার কথা। *(সূরা সাফ্ফ ঃ ৯০ আয়াত)*

সুতরাং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর প্রথম আবির্ভাবে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর দ্বিতীয় আবির্ভাবে (মসীহ্ ও মাহ্দী হিসেবে) সে অবস্থারই সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সময়ে নামায জমা' করে পড়ার প্রয়োজন হয়ে থাকলে পরবর্তীতেও তাই হবে। হাদীসেও তাই ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, "তুজ্মাউ লাহুস্ সালাত" (হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনায় মুসনদে

আহমদ ও সহী মুসলিম) তাঁর জন্যে নামায জমা' করা অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ)-এর সময়ে এ রকম অবস্থার সৃষ্টি হবে যাতে নামায জমা' করে পড়ার প্রয়োজন দেখা দেবে। আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত নতুন কিছু করে নি। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পদাংক অনুসরণ করছে এবং অনুসরণ করতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। অবশ্য একথা পরিষ্কার করে বলা দরকার যে, বিনা প্রয়োজনে বাহানা করে নামায জমা' করে পড়ার প্রবণতাও ঠিক নয়। আল্লাহ্তা'লা আমাদেরকে এ প্রবণতা থেকে রক্ষা করুন।

"রাব্বানা আমান্না বিমা আনযালতা ওত্তাবা'নার রাসূলা ফাকতুবনা মায়াশ্ শাহেদীন" অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! তুমি যা নাযেল করেছ আমরা তার উপর ঈমান এনেছি এবং আমরা রসূল (সাঃ)-এর অনুসরণ করেছি, সুতরাং তুমি সাক্ষীগণের মধ্যে আমাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করো।

মোনাজাত

আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের মুসল্লীরা নামাযের পর হাত উঠিয়ে মোনাজাত করে না বিধায় ইহাও অনেকের কাছে খট্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

দীর্ঘদিন যাবৎ কোন বিদ্আত চলতে থাকলে পরিশেষে তা শরীয়তের অংগীভূত বলে অনেকে মনে করেন। নামাযের পর হাত উঠিয়ে মোনাজাত করাও এরূপ একটি বিষয়। নবী করীম (সাঃ) নামাযের পর হাত উঠিয়ে মোনাজাত করেছেন বলে সুন্নত ও হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় না। তাবেঈন ও তাবা তাবেঈনের যুগে এমন কি এখনও মক্কা মদীনায় এর প্রচলন নেই। তাই আহ্মদীগণ নামাযের শেষে হাত উঠিয়ে মোনাজাত করেন না। তবে নামাযের শেষে নির্ধারিত তসবীহ্সমূহ পাঠ করে থাকেন।

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদীস আমাদের শিক্ষা দেয় যেন আমরা নামাযের সিজদার মধ্যে বেশী বেশী করে দোয়া করি। যেমন তিনি বলেছেন-"আকরাবু মা ইয়াকূনু আব্দু-মের্‌রাব্বেহী ওয়া হুয়া সাজেদুন ফা আকসিরুদ্দুয়া" অর্থাৎ বান্দা তাঁর সমীপে তখন সর্বাধিক নিকটে হয় যখন সে সেজদারত থাকে অতএব, তোমরা বেশী বেশী দোয়া কর।

(সহী মুসলিমঃ কিতাবুস্ সালাত)

বান্দা নিয়্যত করে 'তকবীরে তাহরীমা' (অর্থাৎ যা পাঠ করার পর দুনিয়ার কাজ হারাম হয়ে যায়) পাঠ করে যখন নামাযে আত্মনিয়োগ করে তখনই তার প্রভুর নিকট তার চাওয়া পাওয়ার প্রকৃষ্ট সময়। 'তাস্লীমাত

তাহলীল' বা সালাম ফিরানো (অর্থাৎ যা পাঠ করার পর দুনিয়ার কাজ হালাল হয়ে যায়) এর পর আলাদা মোনাজাত করা নামাযের অংগ নয়।

নিম্নের একটি হাদীস থেকেও আমরা জানতে পারি যে, আঁ-হযরত (সাঃ) তসলীমের সাথে নামায শেষ করতেন ঃ

"আন উম্মে সালামাতা (রাঃ) কালাত কানা রাসূলুল্লাহে (সাঃ) ইযা সাল্লামা কামান্নিসাউ হীনা ইয়াকযী তাসলিমাহু ওয়া মাকাসা ইয়াসীরান কাবলা আন্ইয়াকূমা" অর্থাৎ উম্মে সালামা (রাঃ) বলেছেন, যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) (নামায শেষে) সালাম ফিরাতেন স্ত্রীলোকেরা উঠে যেত তিনি সালাম পূর্ণ করার সময়েই এবং তিনি (নবী-সাঃ) উঠে যাবার আগে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন। *(সহী বুখারীঃ কিতাবুস্ সালাত)।*

ফিকার প্রাথমিক কিতাব কুদুরীতেও লেখা আছে- আত্তাকবীরো তাহ্রীমুন ওয়াত্তাসলীমো তাহলীলুন অর্থাৎ তাক্বীর তাহরীমা দ্বারা নামায শুরু হয় ও অন্যান্য সকল কাজ হারাম হয়ে যায় এবং সালাম দ্বারা নামায শেষ হয় ও অন্যান্য সকল কাজ হালাল হয়।

বাদশাহ্র দরবারে যখন কেউ সাক্ষাৎ করতে যায় তখনই তার চাওয়া পাওয়ার কথা বলা প্রয়োজন। কিন্তু সালাম দিয়ে সেখান থেকে বের হয়ে আসার পর কিছু চাওয়ার সুযোগই থাকে না আর এহেন কার্যকলাপ অশালীন বলে গণ্য। নামাযের ক্ষেত্রেও তাই। একজন মোমেন নামাযের নিয়্যত করে আল্লাহ্তা'লার দরবারে দন্ডায়মান হয়। তার চাওয়া পাওয়ার উৎকৃষ্ট সময় ততক্ষণ যতক্ষণ সে দরবারে হাযির থাকে। সালাম ফিরানো হলে দরবার ভঙ্গ হয়। তখন চাওয়ার সুযোগ কোথায় ? সুতরাং যুক্তির দিক থেকে বিচার করলেও নামাযের পর প্রচলিত মোনাজাত সিদ্ধ নয়। অবশ্য এ কথা ঠিক যে বান্দার নিকট আল্লাহ্তা'লা সর্বদাই উপস্থিত আছেন আর বান্দাও যেন সর্বদা আল্লাহ্তা'লাকে হাযির নাযির হিসেবে ধারণা করে।

পরিশেষে এ কথা বলে রাখা ভাল যে, আহ্মদীগণ বিবাহ-শাদীতে,সভা-সমিতির প্রারম্ভে ও শেষে, কাউকে আল্বেদা বলার সময়ে, মৃত দাফনের সময়ে প্রভৃতি ক্ষেত্রে হাত উঠিয়ে মোনাজাত করে থাকেন। মোনাজাত করা খারাপ কাজ নয়। নামায যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিশেষ মোনাজাত তাই নামাযের শেষে মোনাজাত করার প্রয়োজনই বা কি ? এতে গৌণ বিষয়কে মুখ্য করে দেয়ার রাস্তা খুলে দেয়া হয় আর মানুষ নামাযের চাইতে মোনাজাতের গুরুত্ব দেয় বেশী যেভাবে আজকাল দেখা যাচ্ছে।

মসজিদে গিয়ে মেয়েদের বা-জামাতে নামায পড়াঃ

মসজিদে গিয়ে মেয়েদের বা-জামাতে নামায পড়া নিয়েও অনেকে অনেক সময়ে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে মিথ্যে ও আজে বাজে কথা বলে থাকেন। আগেই বলেছি , আহমদীয়া মুসলিম জামাত আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অনুসরণে নামায ও অন্যান্য ইবাদত বন্দেগী করে থাকেন। হুযুর (সাঃ)-এর সময়ে মেয়েরা মসজিদে গিয়ে বা-জামাত নামায আদায় করতেন। এখনও হজ্জের সময়ে পুরুষ ও মহিলা একত্রে মক্কা মুয়ায্‌মায় নামায সহ অন্যান্য ইবাদত পালন করেন। ঢাকাস্থ বায়তুল মোকাররম মসজিদে ওযূর স্থানের ওপরে মেয়েদের জন্যে নামায পড়ার ব্যবস্থা আছে। সুতরাং মেয়েদের মসজিদে নামায পড়া নিয়ে যারা প্রশ্ন তোলেন তারা যে তাদের অজ্ঞতারই পরিচয় দেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যাইহোক মেয়েদের মসজিদে বা-জামাত নামায পড়ার প্রসংগে কয়েকটি দলিল পেশ করছিঃ

(ক) কুরআন মজীদে 'ইয়াআয়্যুহাল্লাযীনা আমানূ' বলে যে আদেশ নিষেধ এসেছে তার সবটাই পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যে প্রযোজ্য। মহিলাদের জন্যে বিশেষ কোন আদেশ থাকলে সেখানে কেবল মাত্র তাদের উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে। সূরা জুমুআয় যেখানে জুমুআর নামাযের আদেশ দেয়া হয়েছে সেখানে 'ইয়াআয়্যুহাল্লাযীনা আমানু' বলে পুরুষ এবং মহিলা উভয়কে জুমুআর নামাযে সামেল হওয়ার জন্যে তৎপর হতে আদেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং মহিলাদের মসজিদে আসা নিষেধ তা কি করে বলা যায়। বরং মেয়েদের জুমআর নামায থেকে বঞ্চিত রেখে উম্মতের এমন অর্ধেকটা অংশকে পঙ্গু করে রাখা হয়েছে যাদের 'পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশ্‌ত' । মনে হয় আজ যে মুসলিম উম্মাহ্ অনেকটা পেছনে পড়ে গেছে তারও অন্যতম কারণ মেয়েদেরকে জুমুআর খোতবা থেকে বঞ্চিত রাখা। সপ্তাহান্তে খলীফাতুল মুসলেমীন যে দিক-দিশারী খুতবা দেন তাথেকে উম্মতের অর্ধেককে বঞ্চিত রাখলে গোটা উম্মতকে পিছু টানার স্থায়ী ব্যবস্থারই পাকা পোক্ত বন্দোবস্ত হবে, উম্মতের প্রকৃত কল্যাণ হবে না। তবে মহিলারা মসজিদে আসলে অবশ্যই যেন পর্দা করে আসেন। আর এমন সাজ-গোজ করে, সুগন্ধি লাগিয়ে এবং অলংকারাদি পরে যেন না আসেন যাতে পুরুষগণ

প্রলুব্ধ হয়। কেননা শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে আল্লাহ্তালার কালাম স্মর্তব্য— ওয়ালা তাবার্‌রাজনা তাবারুজাল জাহিলিয়্যাতে অর্থাৎ— এবং পূর্বতন অজ্ঞ যুগের পদ্ধতিতে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করিও না। *(সূরা আহযাব ঃ ৩৪ আয়াত)*

(খ) এ প্রসংগে ৩টি হাদীসকেও দলীল হিসেবে পেশ করতে চাই ঃ

(১) আন উম্মে সালামাতা (রাঃ) কালাত কানা রাসূলুল্লাহে (সাঃ) ইয়া সাল্লামা কামান্নিসাউ হীনা ইয়াকযী তাসলীমাহু ওয়া মাকাসা ইয়াসীরান কাবলা আন্ ইয়াকূমা অর্থাৎ উম্মে সালামা (রাঃ) বলিয়াছেন, যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) (নামায শেষে) সালাম ফিরাইতেন স্ত্রী লোকেরা উঠিয়া যাইত তিনি সালাম পূর্ণ করার সময়েই, এবং নবী (সাঃ) উঠিয়া যাইবার আগে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতেন। পূর্বেও এ হাদীসের উল্লেখ এসেছে।

(সহীহ বুখারী ঃ তজরীদ পৃঃ ২১১, বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত)

(২) আন উম্মে আতিয়াতা আন্না রাসূলাল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা কানা ইউখরিজুল আবকারা ওয়াল আওয়াতিকা ওয়া যাওয়াতাল খুদূরি ওয়াল হুইয়াযা ফিল ঈদায়নে ফা আম্মাল হুইয়াযু নাইয়া'তাযিবিনাল মুসাল্লা ওয়াইয়াশহাদ্না দা'ওয়াতাল মুসলিমীনা কালাত এহ্দাহুন্না ইয়া রাসূলাল্লাহে ইন্লাম ইয়াকুন্ লাহা জিলবাবুন কালা ফালতু'রিহা উখতাহা মিন জিলবাবিহা অর্থাৎ হযরত উম্মে আতিয়া বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কুমারী কিশোরীদের, যুবতীদের, পর্দানশীনদের, মাসিক ঋতুবতী নারীদের সবাইকে দুই ঈদের নামাযে উপস্থিত করতেন। ঋতুবতী নারীরা নামায থেকে বিরত থাকতেন; কিন্তু মুসলমানদের ইজতেমায়ী দোয়ায় অংশ নিতেন। একজন প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্র রসূল! যদি কোন মহিলার কাছে চাদর না থাকে তবে ? উত্তরে মহানবী (সাঃ) বল্লেন, তার বোনের উচিত তাকে একটা চাদর দিয়ে দেয়া।

(জামে' তিরমিযী ঃ পৃষ্ঠা ২২৫, এতেকাদ পাবলিশিং হাউস, দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত)

ঋতুবতী মহিলাগণ মসজিদে আসবেন না। যদি মসজিদে ঈদের নামায হয় তাহলে তারা মসজিদের মসল্লা থেকে বারান্দায় বা ভিন্ন কক্ষে আলাদাভাবে বসবে, খুতবা শুনবেন ও দোয়ায় শামিল হবেন।

(৩) আন মুজাহেদীন কালা কুন্না ইন্দা ইব্নে উমারা ফাকালা কালা রাসূলুল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা ঈযানূলিন্নিসায়ে বেল্লায়লে ইলাল মাসাজিদি ফাকালাব্নুহু ওল্লাহে লানা'যানু লাহুন্না ইয়াত্তাখিযনাহূ দাখালান ফাকালা ফালাআল্লাহুবেকা ওয়া ফাআলা আকূলু কালা রাসূলুল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা ওয়া তাকূলু লানা'যানু অর্থাৎ হযরত মুজাহেদ বর্ণনা করেছেন যে, আমরা হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে উমর (রাঃ)-এর কাছে ছিলাম। তিনি বল্লেন, হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমরা মহিলাদেরকে রাতের বেলায় (অর্থাৎ সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত) মসজিদে নামায পড়ার অনুমতি দিও। একথা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে ওমরের ছেলে বল্লেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা এর অনুমতি দিবনা কেননা তারা এটিকে অশান্তির কারণ বানিয়ে ছাড়বেন। তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে উমর ছেলেকে ধমক দিয়ে বল্লেন, আল্লাহ্ তোমাকে শাস্তি দিন। আমি তোমাদেরকে বল্লাম যে, "রসূল করীম (সাঃ) তোমাদেরকে এই আদেশ দিয়েছেন" আর তুমি কিনা বলছো, 'আমি অনুমতি দিব না'। *(জামে' তিরমিযীঃ পৃঃ ২৩৪, ঐ)*

কোন কোন হাদীস থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর যামানায় বা-জামাত নামাযে পুরুষগণ প্রথম কাতারে, মধ্যখানে শিশুরা এবং শেষে মেয়েরা দাঁড়াতেন। অবশ্য আহ্মদীয়া মুসলিম জামাতের মেয়েরা মসজিদে আসেন পর্দা করে এবং তাদের নামাযের স্থানও পর্দার মধ্যে। তাদের যাতায়াতের পথও আলাদা। তারা কেবল পুরুষ ইমামের পিছনে নামায আদায় করে থাকেন আলাদা স্থানে আলাদা ভাবে।